মহান নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বান অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

মহান নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বান অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য — প্রভাস ঘোষ
(১৭ নভেম্বর ২০১৭-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ৪ জানুয়ারি, ২০১৮

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তির সমাবেশে ১৭ নভেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ ইতিমধ্যে বাংলায় 'গণদাবী' ও ইংরাজিতে 'প্রোলেটারিয়ান এরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই ভাষণটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

৪ জানুয়ারি, ২০১৮ **মানিক মুখার্জী**

মহান নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বান অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য

কমরেড প্রেসিডেন্ট, আমাদের পরম বন্ধু বাসদ (মার্কসবাদী)-র কমরেড সাধারণ সম্পাদক, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর সুযোগ্য ছাত্র এবং উত্তরসাধক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য আমরা যাতে মহান নভেম্বর বিপ্লবের পথ অনুসরণ করি এবং বিশ্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে বলিষ্ঠভাবে ঊর্ধে তুলে ধরি, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টিকে কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই নভেম্বর বিপ্লব, তার শতবার্ষিকী উদযাপন আমাদের কাছে অত্যন্ত আবেগের, তাৎপর্যের ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গত বছর ৭ নভেম্বর দিল্লিতে মবলংকর হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করে এক বছরব্যাপী কর্মসূচি নেয়। এই একটি বছর ধরে আমাদের হাজার হাজার কমরেড ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের গ্রাম-শহর-কলকারখানায়-অফিসে-নানা প্রতিষ্ঠানে-পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা সমাবেশ করে এই নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ নভেম্বর বিপ্লব এক মহান সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। ৭০ বছর তার অস্তিত্ব ছিল। গত প্রায় ৩০ বছর তার অস্তিত্ব নেই। 'নভেম্বর বিপ্লব' এই শব্দটাই বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তাদের বুকে কাঁপন ধরায়। তাই তারা চেয়েছে, ষড়যন্ত্র করেছে, ইতিহাস থেকে নভেম্বর বিপ্লবকে মুছে ফেলতে, নভেম্বর বিপ্লবের গরিমাকে কালিমালিপ্ত করতে। এখনকার প্রজন্মের অনেকেই জানে না এই ঐতিহাসিক সমাজবিপ্লবের কাহিনী। এই অবস্থায় আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং প্রেরণাদায়ক— গোটা ভারতবর্ষে প্রচার করে আমরা দেখেছি নভেম্বর বিপ্লবের বার্তা অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। আজকের এই বিশাল সমাবেশও তা প্রমাণ করে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা যারা এসেছেন, বৃষ্টির মধ্যে বসে শুনছেন, বিভিন্ন রাজ্য

থেকে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে, এ রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে, অন্য বক্তারাও জানিয়েছেন, আমিও আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করা সম্ভব

কমরেডস, হাজার হাজার বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে মানব ইতিহাসে— সেই আদিম সমাজের পর থেকে যখন শ্রেণিবিভক্ত দাসসমাজ শুরু হল সেই যুগে, পরে রাজতন্ত্রের যুগে এবং পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের যুগে শোষিত অত্যাচারিত নিস্পেষিত মানুষ চোখের জলে বারবার প্রশ্ন তুলেছে— এই দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে কি? শোষণ অত্যাচার বন্ধ হবে কি? শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে কি? মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে মহান লেনিন এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান স্ট্যালিন নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত করে উত্তর দিয়ে গেছেন— ইতিহাসে শ্রেণিশোষণ উচ্ছেদ করা সম্ভব, শোষিত মানুষ যদি বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সংগঠিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, যদি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে লড়াই করতে পারে তা হলে চিরদিনের জন্য মানবসমাজ থেকে শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিশাসন, অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব। নভেম্বর বিপ্লব এটা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর গতিপথ নির্ধারণে সমাজতন্ত্র নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল

নভেম্বর বিপ্লব বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতায় আলোড়ন তুলেছিল, দেশে দেশে শোষিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবার এই নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীর সব থেকে মহৎ ও যুগান্তকারী ঘটনা নভেম্বর বিপ্লব। মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধু বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বুকে শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করেনি, দেশে দেশে শোষিত শ্রমিক শ্রেণিকে শুধু অনুপ্রাণিতই করেনি, মানবসভ্যতার গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট সমাজতন্ত্র নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেমন আপনারা জানেন, আগে সমস্ত এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনক্ষেত্র ছিল, উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ ছিল। এর বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল তাতে প্রেরণা জুগিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট রাশিয়ার সমাজতন্ত্র। এইজন্য চিনে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেন, ইন্দোনেশিয়ার ডঃ সোয়েকর্ন, আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, এঁরা সকলেই বারবার সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রথমবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে হরিপুরা অধিবেশনে বলেছিলেন, বিশ্বে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আর একদিকে সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্র আমাদের প্রেরণাদায়ক। এ দেশের বিপ্লবীরা সকলেই তাই মনে করতেন। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সব দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল, প্রত্যেকটি আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে, সাহায্য দিয়েছে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র। না হলে সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে পিছু হটত না। সমাজতন্ত্রের সাহায্যের জন্যই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পেরেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এ কথা ঠিক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াইয়ের সংবাদ, বম্বের নৌবিদ্রোহ, তার আগে '৪২-এর আগস্ট বিদ্রোহ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা সমাজতন্ত্রের বিজয়যাত্রা, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র, চিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জয়যাত্রা, ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্কিত করে দেয়। তাড়াতাড়ি তারা বোঝাপড়া করে নেয় ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণির সাথে যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা— এঁদেরও প্রেরণা দিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব। আফ্রিকার ঘানার নেতা কোয়ামে নক্রুমা, কঙ্গোর নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা যাঁকে আমেরিকা হত্যা করেছিল এঁদেরও প্রেরণা ছিল নভেম্বর বিপ্লব। আবার এই দেশগুলি স্বাধীন হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল যাতে এরা স্বাধীনভাবে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তখন সমাজতান্ত্রিক শিবির এগিয়ে এসে উদার হস্তে এই দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। ভারতবর্ষ সহ এই সমস্ত দেশগুলিকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করেছিল স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে। একটা সময় ছিল এই যখন সদ্যস্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলো চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের কবজা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে, নিজেরা জোট-নিরপেক্ষ গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল, তাও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য নিয়েই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি, জাপানি সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করছে, পূর্ব ইউরোপ দখল করেছে, ফ্রান্স দখল করেছে, ইংল্যান্ড দখল করার মুখে, জাপানের সৈন্যবাহিনী বর্মা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, চিন দখল করেছে— এইভাবে গোটা বিশ্ব যখন বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রাতার ভূমিকা পালন করেছিল মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত লালফৌজ। আপনাদের

স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সেই সময়ের বিশ্বের বরেণ্য মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবী মনীষী সকলেই তাকিয়ে ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, প্রতিদিন তিনি খবর নিতেন রাশিয়ার লালফৌজ কতটা এগোচ্ছে। যেদিন শুনতেন এগোচ্ছে না, কাগজ ছুঁড়ে ফেলতেন দুঃখে। যেদিন তাঁর অপারেশন হয় সেদিন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন, লালফৌজ এগোচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন ওরাই পারবে, ওরাই ঠেকাতে পারবে, ওরাই জিতবে। সত্য সেটাই, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকত, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র না থাকত, মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ না হত, তাহলে বিশ্বের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যেত। এটা শুধু আমাদের দাবি নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ণধার চার্চিল, রুজভেল্ট এরা পর্যন্ত সোভিয়েতের এই ভূমিকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে নভেম্বর বিপ্লব মানব ইতিহাসে নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছিল।

আপনারা শুনেছেন, আমাদের পত্রপত্রিকায় পড়েছেন, এই নভেম্বর বিপ্লবকে একদিকে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, সুব্রমণিয়ম ভারতী, মুলক রাজ আনন্দ, কিষণচন্দ, ইকবাল, নজরুল— এইসব সাহিত্যিকরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে 'পথের দাবী' লিখেছেন, যাকে 'বলশেভিক চিন্তা প্রচার করার' অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। নজরুল সাম্যবাদ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের জয়গান গেয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আবার বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, এঁরাও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র অভিনন্দন জনিয়েছিলেন, নেহেরু নভেম্বর বিপ্লবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। গান্ধীজিও প্রশংসা করেছিলেন। যদিও এঁরা কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না। পাশ্চাত্যের রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, এঁরাও সমাজতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কী দেখে?

বুর্জোয়ারা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডাকে পদদলিত করেছে

তাঁরা দেখেছিলেন ফরাসি বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেছিল, সেখানকার ভূমিদাসরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছিল তাতে স্লোগান উঠেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-সেকুলার মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করার। দাবি উঠেছিল গণতন্ত্র কায়েমের। আমেরিকা থেকে উঠেছিল ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল-এর ধারণা। এটা একটা নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল বিশ্বে। কিন্তু এই

বুর্জোয়াশ্রেণি রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের স্তরে, যখন তার কৈশোর-যৌবন ছিল, তার যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, পরবর্তীকালে তা অতিক্রম করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে ক্ষুদ্র পুঁজি যখন বৃহৎ পুঁজি, একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হয়, তখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডা, গণতন্ত্রের ঝান্ডা, মানবতাবাদের ঝান্ডা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে বুর্জোয়া বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান পরবর্তীকালে বুর্জোয়ারাই পদদলিত করেছে। আজ আমরা পৃথিবীর সর্বত্র দেখছি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কী চরম বৈষম্য! বিবিসি বলছে, এক শতাংশ মানুষ ৯৯ শতাংশ মানুষের সম্পদের মালিক। ৩০০ কোটি মানুষের সমান সম্পত্তির মালিক বিশ্বের মাত্র ৮টি পরিবার। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের সমান সম্পত্তির মালিক মাত্র ৫৭টি পরিবার। একদিকে শ্রমিকদের প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয়ের হাতে সঞ্চিত হয়েছে বিশাল ধন সম্পদ, বিশাল ঐশ্বর্য, চলছে তাদের রাজকীয় ভোগবিলাস। অন্য দিকে কোটি কোটি বেকার ও ক্ষুধার্ত মানুষ, ছাঁটাই শ্রমিক অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে। এই চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কি সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব? ফলে পুঁজিবাদ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বৈষম্যের উপরে পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদ মানবজাতির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী গড়ে তুলবে কি, বরং তা ধ্বংস করছে। ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ এসবের মধ্য দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ধ্বংস করছে। আর স্বাধীনতা বলতে পুঁজিবাদ বোঝে লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অবাধে শোষণ করবে, লুণ্ঠন করবে— এই স্বাধীনতা। আর জনগণের রয়েছে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর স্বাধীনতা, আত্মহত্যার স্বাধীনতা। প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই, প্রতিরোধ করার উপায় নেই, করলেই চরম দমন-পীড়ন।

বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল— এই ঘোষণা এখন দাঁড়িয়েছে বাই দ্য মানি পাওয়ার, ফর দ্য মানি পাওয়ার, অফ দ্য মানি পাওয়ার। এই যে গুজরাটে ভোট হবে, হিমাচলে হয়ে গেল, আবার রাজ্যে রাজ্যে হবে, এইসব ভোটের ফলাফল কারা নির্ধারণ করছে? এটা কি জনগণের রায়? বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন জনগণ ভোট দিচ্ছে। আসলে ভোটের রায় নির্ধারণ করে বুর্জোয়াশ্রেণি। তারাই ঠিক করে কে জিতবে। নির্বাচনে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে। এই কোটিপতিদের কালো টাকা, সাদা টাকা বুর্জোয়া দলগুলো ভোটে কাজে লাগায়। আর পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বিশেষ দল বা জোটের পক্ষে হাওয়া তুলে দেয়। পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র সেই ভাবে কাজ করে। অসচেতন, অসংগঠিত মানুষ দিকভ্রান্ত হয়। টাকায় ভোট কেনাবেচা হয়। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক টাকা নিয়ে ভোটে খাটে। এই তো গণতন্ত্র! এই হচ্ছে

বুর্জোয়া গণতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সব দেশেই এভাবেই 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' হয়। আমাদের দেশ সহ সব দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা সকলেই ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী। এরা মানুষকে ঠকায়, কথা দিয়ে কথা রাখে না। শুধুমাত্র মানুষকে ঠকানোর জন্য যত রকমের ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারে তাই করে। ফলে ভোট একটা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। বুর্জোয়ারা নির্বাচনের নামে জনগণকে ঠকাচ্ছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন অস্তমিত তখন সর্বহারা গণতন্ত্রের রক্তিম অভ্যুদয় মনীষীদের মুগ্ধ করেছিল

পশ্চিম দিগন্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন অস্তমিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন পূর্ব দিগন্তে সর্বহারা গণতন্ত্রের রক্তিম অভ্যুদয় বিশ্বের মনীষীদের মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক উত্থিত যথার্থ গণতন্ত্র, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডাকে তাঁরা সশ্রদ্ধচিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রাশিয়ায় না এলে আমার এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত। পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে রাশিয়ায়। পরে ১৯৩৯ সালে আবার কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন, "মানবের নবযুগের তপোভূমি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সেখানে গিয়ে যে আনন্দ এবং আশা পেয়েছি মানব ইতিহাসে কোনও দিন এত আশা আনন্দ পাইনি। আশা করি এদের সাধনা সফল হোক।" নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি মানবজাতিকে দিয়েছে মার্কসবাদ। আর বিংশ শতাব্দীর রাশিয়া দিয়েছে সর্বহারা রাষ্ট্র, সর্বহারা গণতন্ত্র, সর্বহারা সংস্কৃতি। তিনি বলেছেন, বিশ্বে দুটো স্রোত বইছে। একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্রোত, তার বিপরীতে ধাবমান কমিউনিজমের স্রোত। হিটলারের পরাজয়ের অর্থই হচ্ছে কমিউনিজমের বিজয়। কী দেখে তিনি বললেন? নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট সোভিয়েত সভ্যতার অগ্রগতি দেখেই। (*এই সময় প্রবল বৃষ্টির কারণে কমরেড ঘোষ সামনে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা চালাবেন কি না জানতে চান। উপস্থিত সকলেই শুনতে সম্মতি জানান*)

সমাজতন্ত্রে শ্রমিক-কৃষকরাই সংবিধান করে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে

আমাদের দেশের সংবিধান কে তৈরি করেছে? ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংবিধান কে তৈরি করেছে? পুঁজিবাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত কিছু আইন বিশেষজ্ঞ। সংবিধান রাষ্ট্রের কাঠামোর রাজনৈতিক প্রকাশ, তার ভিত্তিতে জনগণের অধিকার ঘোষিত হয়, আইন-কানুন ঠিক হয়, প্রশাসন

চলে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে প্রথমে অস্থায়ী সংবিধান রচিত হয়েছিল। তারপরে ১৯৩৬ সালে স্থায়ী সংবিধান রচিত হয়। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, সেই সংবিধানের খসড়া তৈরি করে কোটি কোটি শ্রমিক কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক গোটা দেশে হাজার হাজার সভা করে এই সংবিধান পড়ে তাদের মতামত দিয়েছে। সেই মতামতের ভিত্তিতে রাশিয়ার সংবিধান রচিত হয়। এটাই যথার্থ বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল বলতে যা বোঝায়, তাই। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভোটে প্রার্থী হত শ্রমিক-কৃষক। আমাদের দেশে কারা ভোটে দাঁড়ায়? গরিব মানুষ ভোটে দাঁড়ানোর কথা কখনও ভাবতে পারে না। যদিও তারাই সংখ্যায় বিপুল গরিষ্ঠ। ভোটে দাঁড়ায় বুর্জোয়া দলের লোকেরা বা তাদের টাকায় তাদের পছন্দের প্রার্থীরা। আর গরিবদের মধ্যে তারা কিছু দালাল সৃষ্টি করে দাঁড় করায়, এই পর্যন্ত। সোভিয়েত সংবিধানে একমাত্র নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল শ্রমিক-কৃষকের। তারাই ভোট দেবে এবং তাদের দ্বারাই কেউ নির্বাচিত হবে। এটা পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। এই হচ্ছে বাই দ্য প্রোলেটারিয়েট, অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, ফর দ্য প্রোলেটারিয়েট।

১৬টি ন্যাশনালিটি স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। রাশিয়ার সংবিধানে ছিল প্রত্যেকটি ন্যাশনালিটির সমান অধিকার। এটাও সংবিধানে ছিল যে, কোনও ন্যাশনালিটি চাইলে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকটি ন্যাশনালিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে মেনে তাদের নিজ নিজ এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংবিধান রচনা করতে পারত। এই অধিকার বহু ন্যাশনালিটি অধ্যুষিত কোনও পুঁজিবাদী দেশে নেই। এই অধিকার একমাত্র সোভিয়েত গণতন্ত্র দিয়েছিল। সোভিয়েতে যাকে মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচন করত, তাকে নিজের কাজ সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হত, এটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই সিস্টেম কোনও পুঁজিবাদী দেশে নেই। আমাদের দেশে ভোটে জেতার পর পাঁচ বছর নির্বাচিত প্রার্থীর দেখাই পাওয়া যায় না। সোভিয়েতে ভোটদাতারা যদি মনে করত নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা কাজ হচ্ছে না, তাকে পাল্টাতে পারত। এই অধিকারও কোথাও নেই। ফলে যথার্থ শোষিত জনগণের গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত সহ সব পুঁজিবাদী দেশেই তীব্র বেকার সঙ্কট

আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি বেকার। আমাদের দেশের হাল আপনারা জানেন। মানুষ পাগলের মতো ঘুরছে কোথাও যদি কোনও কাজ পাওয়া যায়। সামান্য অংশ যারা কাজ পাচ্ছে, তা পাচ্ছে কন্ট্রাকটরের অধীনে, স্থায়ী চাকরি জুটছে না, স্থায়ী মজুরি দেওয়া প্রায় বন্ধ। মালিক যে মজুরি দেবে তাতেই কাজ

করতে শ্রমিক বাধ্য। যখন তখন ছাঁটাই করতে পারে। গ্রামের লোক পাগলের মতো শহরে ছুটছে। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এমনকী খোদ আমেরিকায়, যেটা বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ, সেখানেও এই একই অবস্থা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমার দেশে চাকরি নেই। মার্কিন পুঁজিপতিদের বলছেন, তোমরা সস্তায় বিদেশি মজুর আনছ, তার ফলে আমেরিকার ছেলেরা বেকার হচ্ছে। এটা চলবে না। মার্কিন পুঁজিবাদের এগ্রিগেট বা সামগ্রিক স্বার্থে রাষ্ট্র মাল্টিন্যাশনালদের ডিকটেট করছে যে আউটসোর্সিং বা বিদেশীদের দিয়ে কাজ করানো চলবে না। আমেরিকান শ্রমিক নিয়েই কাজ করতে হবে। এইরকম তীব্র বেকার সংকট সেখানেও। যে আমেরিকা ছিল গ্লোবালাইজেশনের হোতা আজ তার ত্রাহি ত্রাহি রব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছে গ্লোবালাইজেশনে আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী চীন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমাদের দেশে ইকোনমিক অ্যাগ্রেশন হচ্ছে, অর্থনৈতিক আক্রমণ হচ্ছে। বলছেন, আমাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হচ্ছে। কে বলছে? যে দেশ এতদিন ধরে অসংখ্য দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছে! কারণ, আমেরিকার ভোগ্যপণ্যের বাজার এখন চীনের পণ্যে ভর্তি। ফলে মার্কিন শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মার্কিন শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। এখন আমেরিকার কাছে নিজের স্বার্থই প্রথম। সে এখন গ্লোবালাইজেশনের চুক্তি কিছু মানবে না। আবার চীনের প্রেসিডেন্ট এখন গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে সওয়াল করছে অন্য দেশের বাজার দখলের স্বার্থে। এইরকম অবস্থা এখন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায়।

বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল ১৯১৭ সালে। ১০ বছর লেগেছিল প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করল, দেশে কোনও বেকার থাকবে না। সকলেই কাজ পাবে। সেখানে সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তি মাত্রেই কাজ পাওয়ার অধিকারী। তারা বলল, কাজ না করলে খাবার জুটবে না। মানে কাজ না করে কেউ থাকতে পারবে না। ৭০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যা বলে কিছু ছিল না, অর্থনৈতিক মন্দা বলে কিছু ছিল না, মুদ্রাস্ফীতি বলে কিছু ছিল না, বাজারের ওঠানামা বলে কিছু ছিল না।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রই ঘোষণা করেছিল সকল অস্ত্র ধ্বংস করা হোক, যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ হোক

আপনারা অনেকেই জানেন না, বিপ্লবের পরেই লেনিন লিগ অফ নেশনস-এ ঘোষণা করেছিলেন, সব রাষ্ট্র সব অস্ত্র ধ্বংস করুক। অস্ত্রের দরকার নেই। যুদ্ধ

চিরদিনের জন্য বন্ধ হোক। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা রাজি হয়নি। একই ঘোষণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মহান স্ট্যালিন করেছিলেন— পারমাণবিক অস্ত্র সহ সমস্ত অস্ত্র নিষিদ্ধ হোক। যুদ্ধে সমাজের ক্ষতি, লক্ষ কোটি মানুষ মারা যায়। কত দেশ ধ্বংস হয়। এই ঘোষণা অন্য কোনও দেশ করতে পেরেছে? একমাত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র করতে পেরেছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য যুদ্ধ বা পরদেশ দখল প্রয়োজন ছিল না। সব সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য কাজ করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা রাজি হয়নি। রাজি হওয়ার উপায় নেই। যুদ্ধ পুঁজিবাদের প্রয়োজন। দেশের মানুষের যখন কেনার ক্ষমতা নেই, শোষিত মানুষ যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে না, তখন একচেটিয়া পুঁজির বিদেশের বাজার চাই। বিদেশি বাজার দখল করা, লুণ্ঠন করা, শোষণ করার পথে বাধা এলে যুদ্ধ চাই। প্রথম মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা বাধিয়েছিল বাজারের জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সাম্রাজ্যবাদীরা বাধিয়েছিল বাজারের জন্য। আজও তাদের যুদ্ধ প্রয়োজন।

এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। এখন প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই একদিকে কোটি কোটি মানুষ বেকারির জ্বালায়, ছাঁটাইয়ের জ্বালায় ছটফট করছে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, অথচ সামরিক বাজেট বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে সামরিক চুক্তি করেছে। এর আগেও সামরিক চুক্তি করেছিল। আমেরিকার হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা হয়েছে, টু লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি উইল বিকাম বিগেস্ট মিলিটারি পাওয়ার। অর্থাৎ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং ওরা হাত মিলিয়ে বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হবে।

ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে

ভারত একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে। ভারত এখন সাম্রাজ্যবাদী। ভারত এখন বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা নানা জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এমনকী ইংল্যান্ডে, আমেরিকাতেও কলকারখানা করছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ভারতীয় মালিকরা আমেরিকায় যে কলকারখানা করছে তাতে ১ লক্ষ ১২ হাজার মার্কিন শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে। ভারতীয় জাতীয় পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়ায়, আফ্রিকায় মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছে। ভারত এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সিপিএম, সিপিআই এখনও ভারতের জাতীয় পুঁজিকে প্রগতিশীল চিহ্নিত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আউড়ে যাচ্ছে। অথচ রাশিয়ায় কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদ অনুন্নত হওয়া

সত্ত্বেও ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যেহেতু রুশ বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে সেই জন্য লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছেন এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। সিপিএম সিপিআইয়ের এই অমার্কসবাদী ও বিপ্লববিরোধী তত্ত্বের জন্যই এরা কখনও স্বৈরাচার বিরোধিতার নামে জনসংঘ ও পরে বিজেপির সাথে ঐক্য করেছে, কখনও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের হাত ধরছে। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে ভারতকে যুক্ত করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করে চীন রাশিয়ার পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটা অর্থনৈতিক সামরিক জোট গঠন করছে। এটা বিপজ্জনক। লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। আর সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়। যুদ্ধ অর্থনীতির আরও প্রয়োজন যেহেতু ভোগ্যপণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে বিকল্প সামরিক অস্ত্রের বাজার চাই। আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র বিক্রি করছে, জাপানকে অস্ত্র বিক্রি করছে, আরও বিভিন্ন দেশকে অস্ত্র বিক্রি করছে। এর অর্থ হল, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে আমেরিকা তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। একেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্ট্যালিন বলেছিলেন, মিলিটারাইজেশন অফ ইকোনমি। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরাও তাই করছে, অর্থাৎ মিলিটারাইজেশন অফ ইকোনমি অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য পিপল। জনস্বার্থকে বিপন্ন করে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সংকট অনিবার্য।

মানব কল্যাণে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবদান

এর বিপরীত হচ্ছে সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম হল, মুনাফা, আরও মুনাফা, চূড়ান্ত মুনাফা অর্জন। সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা শ্রমিক শোষণ। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম জনগণের বৈষয়িক চাহিদা যত বাড়ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদা যত বাড়ছে তত সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য উৎপাদন। সেখানে শ্রমিক শোষণ করে মুনাফার কোনও প্রশ্ন নেই। শ্রমিক-কর্মচারীর নিয়োগও ঘটেছে ক্রমবর্ধমান হারে। কোনও বাজার সংকট ছিল না, মন্দা ছিল না। কোনও ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন ছিল না। বেকারত্বের প্রশ্ন ছিল না। ক্রমাগত সে এগিয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দু'রকমের মজুরি ছিল। একটা হচ্ছে আর্থিক মজুরি, আর একটা সামাজিক মজুরি। কারখানায় শ্রমিকরা কী মজুরি পাবে সেটা ফ্যাক্টরি কমিটি আর শ্রমিকের প্রতিনিধিরা মিলে ঠিক করত। একটা অংশ তারা অর্থ হিসাবে নিত। আরেকটা

অংশ রাষ্ট্রকে দিত। রাষ্ট্র নিত কী জন্য? কোনও ব্যক্তির মুনাফার জন্য নয়। উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো, সাম্রাজ্যবাদী হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণিই স্বেচ্ছায় তার উৎপাদিত সম্পদের একটা অংশ রাষ্ট্রকে দিত। সর্বোপরি ছিল সামাজিক কল্যাণে ব্যয়। রাশিয়ায় শ্রমিকরা অল্প ভাড়ায় বাড়ি পেত, স্বল্পমূল্যে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য পেত। শ্রমিকরা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, জল, পরিবহণ, কাজের পোশাক পেত। সব থেকে বড় কথা, রাশিয়া সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলন করেছিল। ৮০টি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। আগে ৩০টি ভাষার বর্ণমালা ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদরা ৩০টি ভাষার বর্ণমালা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। প্রাইমারি থেকে ইউনিভার্সিটি স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেন্ড পেত রাষ্ট্র থেকে। এইসব সুযোগের কথা আপনারা কি ভাবতে পারেন? সকল পুঁজিবাদী দেশে, আমাদের দেশে শিক্ষা তো বাজারের পণ্য। একমাত্র যার টাকা আছে, সেই পড়তে পারে। রাশিয়াতে বিনা ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। সকলের জন্য হাসপাতালের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ক্রমাগত ডাক্তার-নার্সের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছিল। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করছিল। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এই ব্যবস্থা কে কবে করতে পেরেছে? পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তো চিকিৎসা পরিষেবা বাজারের পণ্য, বিনা চিকিৎসায় কত কোটি লোক মারা যাচ্ছে। অথচ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা কার্যকরী ছিল। আমাদের দেশে রাস্তায় ভিখারি পাবেন। অন্ধকার নামলে অসংখ্য নারী দেহবিক্রির বাজারে দাঁড়ায়। এই চিত্র ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের, নেপালের, পাকিস্তানের, আমেরিকার, ইউরোপের। সব দেশের। কিন্তু রাশিয়া নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল। যারা এর মধ্যে যুক্ত ছিল তাদের পুনর্বাসন দিয়েছিল। 'পতিতা' শব্দ আমি ব্যবহার করতে চাই না, ইংরেজিতে বলে প্রস্টিটিউট। জারের আমলে এমন প্রস্টিটিউট যারা ছিল সমাজতন্ত্র তাদের প্রত্যেককে ট্রেনিং দিয়ে সুশিক্ষিত করেছিল, যাতে তারা মর্যাদা সহকারে সুস্থ নাগরিক জীবন যাপন করতে পারে তার বন্দোবস্ত করেছিল। প্রত্যেক দেশের ফুটপাতে অসংখ্য শিশু, ভিখারি পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই শিশুদের, ভিখারিদের পুনর্বাসিত করেছিল। রাশিয়া নারীমুক্তির পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেছিল। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এবং আমাদের দেশে মেয়েরা এখনও মূলত অন্তঃপুরে বন্দি। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আসতে পারে না। শিক্ষার সুযোগ পায় না। তারা পুরুষশাসিত সমাজে বন্দি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তাদের মুক্তির দ্বার খুলে

দিয়েছিল। নারী পুরুষের সমানাধিকার দিয়েছিল, সমকাজে সমবেতন দিয়েছিল এবং নারীকে যাতে রান্নায় ব্যস্ত থাকতে না হয় তার জন্য ১০/১৫টি পরিবার নিয়ে কো-অপারেটিভ কিচেন, কো-অপারেটিভ ডাইনিং হল, কো-অপারেটিভ লন্ড্রি— এ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যাতে কোনও পরিবারে কেউ আটকে না থাকে। সন্তানসম্ভবা মায়েদের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি সন্তান জন্মের ১২ সপ্তাহ আগে থেকে জন্মের ১২ সপ্তাহ পর পর্যন্ত। তারপরে ১ বছর সবেতন ছুটি। তারপরে কাজে গেলে ক্রেশে সন্তানকে রেখে দিত। সেই সন্তানকে খাওয়ানোর, পোশাক দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন, নার্সারির ব্যবস্থা ছিল এই শিশুদের লালনপালন করার জন্য। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিক-কৃষকরা বছরে ১৫ দিন সবেতন ছুটি পেত। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের ধারে স্যানেটোরিয়ামে যেত। এই ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে শ্রমিকদের ৬ দিন দৈনিক ৮ ঘণ্টা, পরে ৭ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়, পরে ৬ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাব করেছিলেন স্ট্যালিন। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, যাদের দেখার কেউ ছিল না, তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে আদালতে বিচারপ্রার্থীকে কোনও ব্যয় করতে হত না, উকিল নিয়োগ সহ সব ব্যয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রই বহন করত। সেখানে শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের আলাদা রোজগার করতে হত না, রাষ্ট্রই তাঁদের সকল দায়িত্ব বহন করত। শহরে-গ্রামে হাজার হাজার লাইব্রেরি, থিয়েটার মঞ্চ, সিনেমা হল ছিল বিনাব্যয়ে বিশ্বসাহিত্য পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক বিনোদনের জন্য। রাষ্ট্রের ব্যয়ে স্বাস্থ্যচর্চা, ক্রীড়া ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। যার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অলিম্পিকে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। বিজ্ঞানে এত অগ্রগতি ঘটিয়েছিল যে, পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত নোবেল কমিটি ১২ জন সোভিয়েত বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নই বিশ্বে প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছিল। আমি কিছু দিক মাত্র উল্লেখ করলাম। এটা শুনে মনে হবে স্বপ্নলোকের স্বর্গরাজ্য। আর এটাই বাস্তবে সম্ভব করেছিল মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। এ কাজ সম্ভব হল কী করে?

মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগ করেই লেনিন যা অসম্ভব বলে বিবেচিত, তাকে সম্ভব করেছিলেন

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র লেনিনের কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তিনি মার্কসের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। এটা মার্কসেরও কল্পনাপ্রসূত নয়। মার্কস বিজ্ঞানকে সত্যানুসন্ধানে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কসের আগে বিভিন্ন যুগে যাঁরা দার্শনিক ছিলেন, চিন্তানায়ক ছিলেন, তাঁদের সময়ে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি ঘটেনি। তখন

একজন দার্শনিকের মনের উপলব্ধিকেই সত্য বলে গণ্য করা হত। সত্য নির্ধারণ করতে একজন ব্যক্তির মনে হওয়া, একজন চিন্তানায়কের মনে হওয়া, একটা গ্রন্থে লিখিত বক্তব্য— এটাই কি ঠিক? তাহলে বিদ্যুৎ কী, বিদ্যুৎ কী করে উৎপাদন করা যায়, জল কী, হাইড্রোজেন কী, অক্সিজেন কী, ইলেকট্রন কী, মেঘ-বৃষ্টি হয় কেন, জোয়ার-ভাটা হয় কেন— এসব প্রশ্নে সকলে সর্বসম্মতভাবে সত্য নির্ধারণ করে একমত হবে কী করে? একই প্রশ্নে বিভিন্ন চিন্তানায়ক ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থেও বিভিন্ন উত্তর আছে। সর্বসম্মতভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণিত সত্যের ভিত্তিতে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজগতের, বস্তুজগতের বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছে, সেই নিয়মগুলিকে মালার মতো গেঁথে নিয়ে, কো-রিলেট করে, কো-অর্ডিনেট করে তার থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মহান মার্কস। যেটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আবিষ্কৃত সাধারণ নিয়ম। তিনি দেখিয়েছেন, গোটা বিশ্বপ্রকৃতি, প্রাণীজগৎ, মানবজীবন— সবকিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল, গতিশীল। আবার এই গতি, পরিবর্তন কিছু সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি ও বস্তুজগতের পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বিজ্ঞানের দ্বারা যেমন জানা যায়, মানবসমাজের পরিবর্তনের নিয়মকেও তেমনই জানা যায়। মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করেই লেনিন এতকাল অসম্ভব বলে বিবেচ্যকে সম্ভব করেছিলেন।

ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ

এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। অত্যাচার থেকে মুক্তির চিন্তা দাসপ্রথার যুগে দাসদের প্রয়োজনে এসেছিল। অত্যাচারিত দাসরা মুক্তি কামনা করেছিল। এই অত্যাচারিত দাসদের চোখের জলই ঈশ্বরচিন্তার জন্ম দিয়েছিল। এ কথা বলেছেন মহান মার্কস-এঙ্গেলস, মহান শিবদাস ঘোষ। অনেকে বলে আমরা মার্কসবাদীরা ধর্মকে অশ্রদ্ধা করি। এটা ঠিক নয়। মার্কসবাদই ধর্মকে ইতিহাসে যথার্থ শ্রদ্ধার স্থান দিয়েছে। বরং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা, বেকন, হবস, ফুয়েরবাক, কান্ট প্রমুখ বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে ইতিহাসের বিচ্যুতি— অ্যাবারেশন অফ হিস্ট্রি। মানবসমাজের উদ্ভবের প্রথম দিকে ধর্মীয় চিন্তা ছিল না, এটা সত্য। যেমন এখনও আন্দামানে যান— জারোয়া আছে, আন্দামানি আছে। এদের মধ্যে সম্পত্তি নেই, মালিকানা নেই, ধনী-গরিব নেই। এদের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তাও নেই। ধর্মীয় চিন্তা এসেছে দাস যুগে। সেজন্য মার্কস বলেছেন, "ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস। বলেছেন, ধর্ম

বিবেকহীন পৃথিবীর বিবেক, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। ধর্মীয় প্রতিবাদ অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদ" (অন রিলিজিয়ন)। এঙ্গেলস খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন, সব ধর্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য সেই কথা। বলেছেন, "ধর্ম চেয়েছিল এই দুঃখ-দুর্দশা, এই বন্দিজীবন থেকে স্যালভেশন, মানে মুক্তি এবং স্বর্গে সেই মুক্তি পাওয়া যাবে। আর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে সমাজের রূপান্তরের দ্বারা সেই স্বর্গ এই মাটির পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে।" (অন রিলিজিয়ন)

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও ব্যাখ্যা করে দেখালেন, "মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বরচিন্তা এসেছে কেন? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে, মানুষ যখন স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, সমাজে যখন শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। মানুষ যখন দেখেছে যে, যিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাঁর ইচ্ছায় যে আইন তৈরি হয়, সেই আইন সকলকেই মেনে চলতে হয় এবং সেই কারণে সমাজও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়। এরকম একটি সময়ে এসে একটা চিন্তা মানুষের মগজে ধাক্কা দিয়েছে। মানুষ লক্ষ করেছে, এই যে বিশ্বচরাচর, এই যে দুনিয়া সে একটা নিয়ম মেনে চলছে— দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হচ্ছে। ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে— শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নিয়ম মেনে ঘুরে ফিরে আসছে। জোয়ার-ভাটা হচ্ছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে। সমস্ত কিছু নিয়ম মেনে ঘটছে। মানুষ ভেবেছে, একজন শাসক না থাকলে, একজন আইনপ্রণেতা না থাকলে, একজন প্রভু বা 'মাস্টার' না থাকলে সমাজই যেখানে নিয়ম মেনে চলতে পারে না সেখানে এই যে বিশ্বচরাচর ও দুনিয়া নিয়ম মেনে চলছে, নিশ্চয়ই এর পিছনেও একজন প্রভু বা মাস্টার আছে। অর্থাৎ, সমাজের শৃঙ্খলার পেছনে শাসনকর্তার যে ভূমিকা বর্তমান, তাকে লক্ষ করে প্রকৃতি ও বিশ্বচরাচরের নিয়ম মেনে চলার কারণকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দু'টি ঘটনার মধ্যে যে সাদৃশ্য তাদের মনে ধাক্কা দিয়েছে তাকে ভিত্তি করেই তারা দুনিয়ার একজন প্রভু বা 'সুপার মাস্টার' আছে— এইভাবেই ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে।... আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায়-অন্যায়বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে এবং সেইদিক থেকেও ধর্ম সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইতিহাসে ধর্ম যে স্তরে যতটুকু সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে, সমাজ-অগ্রগতির ক্ষেত্রে ততটুকুই তার ঐতিহাসিক মূল্য। একে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, ইতিহাসকে অস্বীকার করা।"

(*মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক*)। বিশ্বেরও প্রভু আছে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, দাসপ্রভু-দাস নির্বিশেষে তারই সন্তান। এই চিন্তা সেই যুগে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে। তাঁরা তাঁদের চিন্তায় সমাধান হিসাবে যে উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন, সেটাকে সৎ মনেই ভেবেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন। তাঁদের কাছে এগুলি ছিল সবই ধর্মীয় বাণী। সেই ধর্মীয় বাণী প্রচার করতে গিয়েই প্রথম দিকে ধর্মপ্রচারকরা দাসপ্রভুদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। অনেকে অনাহারে মারা গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সেই যুগে ধর্ম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজে ন্যায়নীতিবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ প্রতিষ্ঠায়, ন্যায়-অন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রগতিশীল ও মানব কল্যাণমূলক ভূমিকাই পালন করেছিল। এই হচ্ছে ইতিহাস।

আবার এটাও ঠিক, পরবর্তীকালে ধর্মের এই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যেমন আজকের দিনে মানবজীবনের কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের পথ কোনও ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। বরং যে পুঁজিপতিরা প্রথম যুগে বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আজ তারাই অত্যাচারিত মানুষকে বিপথে চালিত করার জন্য ধর্মের অপব্যবহার করছে, গরিব মানুষকে বোঝাচ্ছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, এটা তাদের পাপের ফল, পুঁজিবাদী শোষণ এর জন্য দায়ী নয়। পূর্বজন্মে পুঁজিপতি-বড় ব্যবসায়ীরা এত পুণ্য করেছে যে বিধাতা তাদের গরিবের রক্ত শুষে নির্বিচারে শোষণ-অত্যাচারের অধিকার দিয়েছে, ফলে এ যেন বিধির বিধান, এর কোনও পরিবর্তন নেই। এ জন্যই পুঁজিবাদের আজ ধর্মের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ধর্মান্ধতা জাগিয়ে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানধর্মী মন ধ্বংস করা এবং ভোটে কাজে লাগানো। ধুরন্ধর এই শোষক ও শাসক শ্রেণির এই 'ধর্মবিশ্বাস' শয়তানি। আর এক দল ধর্ম নিয়ে বিরাট ব্যবসা করছে, বহু অর্থ ও সম্পদের মালিক হচ্ছে। যদিও বহু সাধারণ সৎ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঠিকমতো বোঝালে নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়।

ধর্মীয় চিন্তার ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুক্তির আহ্বান মার্কসবাদই কার্যকর করতে পেরেছে

আজ ধর্মের এই পরিণতি ঘটলেও মার্কসবাদ দেখিয়েছে, ধর্ম প্রথম যুগে দাসদের মুক্তির বাণী, সমাজ-কল্যাণের আহ্বান নিয়েই এসেছিল। কিন্তু আপনারা জানেন, এই ধর্মকে ভিত্তি করেই রাজতন্ত্র যখন এল, তখন ধর্মকে হাতিয়ার করেই রাজতন্ত্র নতুন অত্যাচার সৃষ্টি করল। এই রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার মুক্তি কামনায়, সাম্যের কামনায় ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধেই তৎকালীন গণতান্ত্রিক ও

বিজ্ঞানধর্মী মননের ভিত্তিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। সেদিন বুর্জোয়ারা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল, সেকুলারিজমের পতাকা তুলেছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত এগুলি পূরণ করতে পারেনি। যেটা আমি আগে আলোচনা করে গেছি। মার্কসই দেখালেন, কেন এটা পারেনি। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদ শ্রমিককে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে সারপ্লাস ভ্যালু উৎপাদন করে, শোষণ করে, যা এর আগে কোনও অর্থনীতিবিদ দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ, পুঁজিবাদও শোষণভিত্তিক সমাজ, সে সাম্য আনতে পারে না। ফলে ধারাবাহিকতা বিচার করলে সেই দাসপ্রথার যুগে দাসদের যে মুক্তির আকাঙক্ষা সেদিন পূরণ হয়নি, রাজতন্ত্রের যুগেও পূরণ হয়নি, পুঁজিবাদের যুগে পূরণ হয়নি, সেই মুক্তির আকাঙক্ষাই মার্কসের মাধ্যমে মূর্ত হল। মার্কস বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে দেখালেন, এই মুক্তি সম্ভব। তিনি দেখালেন, বস্তুজগতের মতো, প্রকৃতিজগতের মতো মানবসমাজও পরিবর্তনশীল। আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, তারপর রাজতন্ত্র, তারপর পুঁজিবাদ, এই যে পরপর আসছে, এটা হঠাৎ ঘটনা নয়, কারও খেয়ালিপনা নয়। এটা নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। তিনি দেখালেন, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর শ্রেণিসংগ্রামই হচ্ছে সমাজ পরির্বতনের প্রধান চালিকা শক্তি। শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে দাসরা দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করেছে, ভূমিদাসরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে উচ্ছেদ করেছে সামন্ততন্ত্রকে বা রাজতন্ত্রকে। একই ভাবে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে শ্রমিক শ্রেণি, প্রতিষ্ঠা করবে সমাজতন্ত্র। তারপর আসবে সাম্যবাদ। এরপরও আসবে পরপর উন্নততর নতুন সমাজব্যবস্থা। এটা ইতিহাস নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এখানেই মহান মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক ভূমিকা।

প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার লেনিনীয় পদ্ধতি কমরেড শিবদাস ঘোষ অনুসরণ করেছেন, যেটা সিপিআই-সিপিএম করেনি

এই মার্কসবাদকেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মহান লেনিন কার্যকর করলেন রাশিয়ার মাটিতে। মনে রাখবেন, একটা দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হলে, কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, এই প্রশ্নটা মার্কসের সময় সেইভাবে আসেনি। মার্কসের সময়টা সর্বহারা বিপ্লব করার সময় ছিল না। বিপ্লবের পথ তিনি নির্ধারণ করেছেন। লেনিনই নির্ধারণ করেছেন, পরবর্তী যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুগ, সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। এ যুগে একটা দেশে মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হলে কী পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হয়, এটা লেনিন নির্ধারণ করলেন। যাকে আমরা বলি লেনিনীয় পদ্ধতি। লেনিন বললেন, একটা কনফারেন্স করে, একটা মিটিং করে, একটা ডিক্রি জারি করে যথার্থ মার্কসবাদী

পার্টি গঠন করা যায় না। তার জন্য বেশ কিছু দিন ধরে আদর্শগত সংগ্রাম চাই। ইউনিটি অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ মার্কসবাদী চিন্তার ঐক্য চাই। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য চাই। পুরনো পার্টি আরএসডিএলপি মার্কসবাদী বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না। তার ভিতরে লেনিন লড়াই করলেন। তার থেকে বেরিয়ে এলেন। ন'বছর লড়াই করলেন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে তোলার জন্য। এই কাজটা এ দেশে সিপিআই করেনি। তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রাম না করে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে একটা পার্টি খাড়া করলেন। যদিও তাঁরা সৎ ছিলেন, কিন্তু লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেন না। লেনিন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, দল গঠনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আরও উন্নত করেছেন। লেনিন বলেছেন, মার্কস এঙ্গেলস মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। যারা বাস্তবে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে তাদের পরিবর্তনশীল জীবনের সাথে মার্কসবাদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আরও বিকশিত করতে হবে, আরও উন্নত করতে হবে। এটা লেনিন নিজে করেছেন। স্ট্যালিনও করেছেন। মাও সে-তুঙ-ও করেছেন। ভারতে তথাকথিত কোনও কমিউনিস্ট নেতা এ কাজ করেননি। এ দেশে এই দায়িত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষ পালন করেছেন। তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত করেছেন, উন্নত করেছেন। লেনিন বলেছেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লাইন— বিশেষ দেশে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ হবে। তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী ফ্রান্সে একভাবে, জার্মানিতে একভাবে, রাশিয়াতে আর একভাবে প্রয়োগ হবে। জেনারেল লাইনকে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সাধারণ লাইনকে এদেশের বিশেষ পরিস্থিতি, বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রয়োগ— এসবই কমরেড শিবদাস ঘোষ করেছেন। সেটা অবিভক্ত সিপিআই বা পরে সিপিএম করতে পারেনি। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবের তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না। কমরেড ঘোষ দেখালেন, এই বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে লেনিন বুঝিয়েছেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে গড়ে তোলা বিপ্লবী তত্ত্ব। লেনিনের এই শিক্ষাকে কমরেড ঘোষই এদেশে কার্যকর করেছেন। সেটা সিপিআই সিপিএম করেনি। ফলে তারা যৌথ নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে তুলতে পারেনি। এর ফলে যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে তারা গড়ে ওঠেনি। সিপিএম, সিপিআই সর্বহারা শ্রেণির দল না হয়ে ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলির মতো মার্কসবাদের তকমা লাগিয়ে পেটি বুর্জোয়া দল হিসাবে থেকে গেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও কিছু অবদান রেখেছেন, যা এই সভার আলোচ্য বিষয় নয়।

স্ট্যালিন সমাজতন্ত্রকে রক্ষা ও উন্নত করেছেন

লেনিন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) গড়ে তুললেন সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসাবে। তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত করে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে এলেন। কমরেড স্ট্যালিন যার নাম দিয়েছেন লেনিনবাদ যা হচ্ছে সাম্রাজবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আর, লেনিন দেখিয়েছেন রাশিয়ার বিপ্লব হবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের বিপ্লব, এভাবে বিপ্লবের লাইন নির্ধারণ করলেন। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিনরা আপত্তি করেছিল— এক দেশে সমাজতন্ত্র হয় না, কৃষকদের সাথে মৈত্রী হয় না, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব হয় না— এই সব প্রশ্ন তুলেছিল। এ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লেনিনকে বিপ্লব সফল করতে হয়েছে। বিপ্লবের পর রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন ছিল। তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ রাশিয়া। অন্য দিকে আঠারোটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ ঘোষণা ছাড়াই চারদিক ঘিরে রাশিয়াকে আক্রমণ করল। এরা গণতন্ত্রের কথা বলে। অথচ এভাবে আক্রমণ করল, তারা সমাজতন্ত্রকে টিকতে দেবে না। না হলে রাশিয়ার প্রভাব তাদের দেশেও পড়বে, সেখানকার শ্রমিকরাও বিপ্লব করবে। তাই শিশু সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করল। রাশিয়ার তখন কী দুর্দিন! ঘরে দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক সংকট তীব্র, আর বাইরে থেকে এল আক্রমণ। ভিতরে তখনও শত্রুশ্রেণি গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। এই অবস্থায় ১৯১৮ সালে লেনিনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। গুলিবিদ্ধ হন তিনি। ১৯২৪ সালে মারা যান। তখন রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। সেই সময় পার্টি নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড স্ট্যালিনকে। কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে সোভিয়েতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কথা আপনারা শোনেন, এরও পথপ্রদর্শক রাশিয়া। পাঁচ বছর লাগেনি, চার বছরেই রাশিয়া বেকারি মুক্ত হল, সকলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করল। এই কাজটি হয়েছে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। এটা খুব সহজ ছিল না। বাইরের কোনও সাহায্য নেই, অর্থনৈতিক অবরোধ, ভিতরে ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ কামেনেভ বুখারিন, এরা দলের মধ্যে থেকেও দলবিরোধী কাজ করছে, লেনিনের শিক্ষাকে বিকৃত করছে, কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের উত্তর দিতে হচ্ছে কমরেড স্ট্যালিনকে। এটা একটা আদর্শগত লড়াই। আর একটা লড়াই বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে। আরও একটা লড়াই হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য স্ট্যালিনের আহ্বানে সমগ্র দেশের শ্রমিক-কৃষক

বলতে গেলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে। তারপর ১৯৩৪ সালের দিকে রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল।

সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য এরপর হল আর একটা ষড়যন্ত্র। বাইরের আক্রমণ ছিল, ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল। এটা মারাত্মক আক্রমণ। পার্টির প্রথম সারির নেতা কিরভকে লেনিনগ্রাডে পার্টির হেডকোর্য়াটারের মধ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীকে ধরার পর জেরা করে জানা যায়— সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলছে— বহু নেতা এতে যুক্ত। দেশের মিলিটারির মধ্যে, প্রশাসনের মধ্যেও এরা বিরাট সংযোগ গড়ে তুলেছিল ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য হিটলারকে, মুসোলিনিকে মদত জোগাচ্ছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স আমেরিকা। এটা আপনারা অনেকে জানেন না। আমি এখানে উল্লেখ করছি ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য। তিনি বলছেন, "সো-কলড ডেমোক্রেটিক পাওয়ার গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স উইথ দি ব্যাকিং অফ আমেরিকা, কন্সপায়ারিং টু ডেসট্রয় সোস্যালিজম ইন সোভিয়েত ইউনিয়ন।" খুব উদ্বেগের সাথে বলেছেন তিনি এ কথা। প্রথম দিকে হিটলারকে মুসোলিনিকে ব্যাক করেছিল এরা, যাতে রাশিয়াকে ধ্বংস করা যায়। আর হিটলারের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হল ট্রটস্কির অনুচররা এবং জিনোভিয়েভ কামেনেভ বুখারিনরা। মিলিটারির মধ্যে এদের লোক, প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে এদের লোক ছিল। পরিকল্পনা ছিল কিরভের পর স্ট্যালিনকে হত্যা করবে, তারপর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে। এর মধ্যে এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটাবে যাতে জার্মানি রাশিয়াকে দখল করতে পারে। তারপর এরা ক্ষমতায় বসবে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য এই ছিল পরিকল্পনা। ফলে সোভিয়েতের ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা এভাবেই একটা মারাত্মক আক্রমণ করল সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করার জন্য। এটা হল রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র। এই নিয়েই বিখ্যাত মস্কো ট্রায়াল হল, যা নিয়ে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটনা করা হয়।

ঐতিহাসিক মস্কো বিচার

একটা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিচার হচ্ছে, কিন্তু গোপনে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে বিচার করেছে। পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রদূতদের এবং বড় বড় আইনজীবীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য। সেখানে কোনও গোপনীয়তা ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণে অপরাধীরা দোষ স্বীকার করে। আমি শুধু এক জনের কথা উল্লেখ করছি। মার্কিন

রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস। তিনি 'মিশন টু মস্কো' বইতে লিখছেন, এই রকম নিরপেক্ষ বিচার, ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত বিচার অন্য কোনও দেশে কোনদিন হয়নি। অপরাধীরা দোষ স্বীকার করছে। বলছেন, অপরাধীদের চেহারা দেখে এমন কোনও প্রমাণ মিলবে না যে তাদের উপর বলপ্রয়োগ হয়েছে। সেই সময়ের ব্রিটেনের একজন নামকরা আইনজীবী, ডি এন প্রিট গিয়েছিলেন লন্ডন থেকে মস্কোতে। এই বিচার দেখে তিনি কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে মস্কো ট্রায়াল। এরপর সেনাবাহিনীতে, প্রশাসনে এদের যারা এজেন্ট ছিল তাদের বন্দি করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যারা মারাত্মক অপরাধ করেছে তাদের মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়। এটাকে ভিত্তি করে এখনও বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম স্ট্যালিন খুনি, স্ট্যালিন নরঘাতক, স্ট্যালিন অত্যাচারী— এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিচারকে সেই সময় রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনরা সমর্থন করেছিলেন। এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশি আন্দোলনের যোদ্ধারা এর কোনও বিরুদ্ধতা বা অপপ্রচার করেননি। কারণ তাঁরা এর যৌক্তিকতা বুঝেছিলেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। অথচ এই ট্রায়াল নিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ও তাদের দালাল সংশোধনবাদীরা এখনও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

শত অপপ্রচার সত্ত্বেও মহান স্ট্যালিন স্বমহিমায় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন

আমি প্রশ্ন করতে চাই, প্রথম মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়েছিল— সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়েছিল? তাতেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারায়, ব্যাপক ধ্বংস হয়। এর জন্য দায়ী কে? সাম্রাজ্যবাদ। আমি প্রশ্ন করতে চাই, এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হত্যা করেছে, ফাঁসি দিয়েছে কারা? সাম্রাজ্যবাদ। আমি প্রশ্ন করতে চাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপান পরাজয়ের মুখে, আত্মসমর্পণের মুখে তখন হিরোসিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, আরও কয়েক লক্ষ মানুষকে পুরুষানুক্রমে পঙ্গু করেছে কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কেন? সোভিয়েত লালফৌজ চীনকে মুক্ত করে, কোরিয়াকে মুক্ত করে জাপানের দিকে এগোচ্ছে, তাকে আটকাতে হবে— যাতে জাপান আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে। অথচ এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জাপানে বোমাবর্ষণের পরিণাম দেখে প্রচণ্ড আঘাত পান। অতি দুঃখে তিনি বললেন, পরের জন্মে আমি যদি জন্মাই তাহলে বিজ্ঞানী না হয়ে যেন ছুতোর মিস্ত্রি হয়ে

জন্মাই। বিজ্ঞানের কী অপব্যবহার! কে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করাল? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। ফ্যাসিস্ট হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে, কমিউনিস্টকে হত্যা করেছে। এই সব নিয়ে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ও বুর্জোয়াদের কেনা বুদ্ধিজীবীরা কোনও প্রশ্ন তোলে, আলোচনা করে? ভিয়েতনামের মানুষ প্রথমে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তারপর জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এরপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলেছিল। এর চেয়ে চরম অপরাধ কী হতে পারে? সদ্য ইরাককে ধ্বংস করল কারা? মারণাস্ত্র আছে এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাককে ধ্বংস করল। বিশ্বে আজ প্রমাণিত যে এটা মিথ্যা। লিবিয়াকে ধ্বংস করল কারা? আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল কারা? এই তালিবান, আলকায়দা, আই এস-এর স্রষ্টা কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। অস্ত্র জোগাচ্ছে কে? ওরা। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ওরাই সৃষ্টি করেছে। এই সিরিয়াতে আক্রমণ চালাচ্ছে কারা? কই, আমাদের দেশের 'নিরপেক্ষ' সংবাদমাধ্যম তো এই সব নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না! বিশ্বমানবতার চরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না। কিন্তু যখন তখন মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করে। ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে ছিল মহান স্ট্যালিনের দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। একমাত্র আশা, হিটলার-মুসোলিনির আক্রমণ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারেন মহান স্ট্যালিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেটা সফল করেছিল। পূর্ব ইউরোপকে মুক্ত করেছে। সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল, সমস্ত সামরিক অস্ত্র বাতিল কর, সামরিক চুক্তি বাতিল কর। আমরা এর জন্য প্রস্তুত। বিশ্বকে যুদ্ধের হুমকি থেকে মুক্ত কর। এই ছিল মহান স্ট্যালিনের আহ্বান। তিনি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমাজতন্ত্রকে ঘিরে ন্যাটো, সিয়াটো প্রভৃতি সামরিক জোট গড়ে তুলল তখন বাধ্য হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আত্মরক্ষার জন্য ওয়ারশ চুক্তি করতে হল। এই হচ্ছে ইতিহাস।

স্ট্যালিন পার্টি চালাতেন, রাষ্ট্র চালাতেন মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী। বিদেশের যারাই তাঁকে দেখেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, অত্যন্ত নিরহঙ্কার। সবসময় নিজেকে লেনিনের ছাত্র বলে পরিচয় দিতেন। কেউ যদি লিখতেন আমি স্ট্যালিনের ছাত্র, তবে বলতেন তুমি আমার ছাত্র হতে পার না, কারণ আমি নিজে লেনিনের ছাত্র। ছাত্রের ছাত্র হতে পার না। সব সময় এ কথা বলতেন। তিনি বলছেন, আমাকে সৃষ্টি করেছে পার্টি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বলতেন আমার কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে সে কৃতিত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির। চার্চিল যুদ্ধের সময়

দেখা করতে গিয়েছেন, দেখে চমকে গেছেন, স্ট্যালিন বাস করছেন লন্ডনের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা যেমন ঘরে বাস করতেন সেই ধরনের ঘরে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এটা ভাবতে পারেননি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস তাঁর মেয়েকে লিখছেন, স্ট্যালিনের সম্পর্কে যত নিন্দা শোন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র হচ্ছেন স্ট্যালিন। লিখেছেন, স্ট্যালিনকে দেখলে একটা অপরিচিত বাচ্চাও তার কোলে বসতে চাইবে, এমন মানুষ হচ্ছেন স্ট্যালিন। জন গান্থার, সে যুগের নামকরা সাংবাদিক, তিনি বলছেন, মুসোলিনিকে লোকে ভয় করে, হিটলারকে অন্ধের মতো মানে, স্ট্যালিনকে মানে অন্তরের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার থেকে। এখানেই পার্থক্য। বার্নার্ড শ-কে একজন জিজ্ঞাসা করেছে, স্বাধীনতা কোন দেশে আছে? বার্নার্ড শ উত্তর দিচ্ছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেখানে মহান স্ট্যালিন আছেন। এখানেই একমাত্র যথার্থ স্বাধীনতা পাবে। রমাঁ রলাঁ বলছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য কাজ করে যাব। আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মে এবং লক্ষ্যে বিশ্বাসী। মহান স্ট্যালিন বিশ্বে একটা ধ্রুপদী যুগের সূচনা করে গেছেন, বলছেন রমাঁ রলাঁ। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পরাস্ত তখন সিঙ্গাপুর বেতার থেকে কী ভরসা ব্যক্ত করে নেতাজি বলেছিলেন, এখনও মার্শাল স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, তাঁর উপরই নির্ভর করছে ইউরোপ ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ। এঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না।

স্ট্যালিন অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর দেহরক্ষী আলেক্সি রিবিন লিখছেন, তিন-চারটে পোশাকের বেশি তিনি পরতেন না। ছিঁড়ে গেলে বলতেন, সেলাই করে দাও। অত বড় রাষ্ট্রনায়ক এভাবে থাকতেন। শ্রমিকের ছেলে, শ্রমিকের ছেলের মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। এই স্ট্যালিন সম্পর্কে, আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত প্রবল চর্চা হত। দু'টি নাম— নেতাজি আর স্ট্যালিন। এই ছিল চর্চা।

আপনারা জানেন, ভগৎ সিং মৃত্যুর আগে মার্কসবাদ জিন্দাবাদ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান তুলেছিলেন। তিনি কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বারীন ঘোষকে লিখেছেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী দিনে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র দেখেই তো এঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ বুর্জোয়ারা চালাচ্ছে, অপপ্রচার চালাচ্ছে, সেটা ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নয়, সেটা আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, সর্বহারা বিপ্লব ও প্রগতির বিরুদ্ধে, কারণ তিনি ছিলেন ও হয়ে আছেন এ সবের মূর্ত প্রতীক। আমরা জানি, মিথ্যা কিছু দিনের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, দীর্ঘদিন পারে না। ইতিমধ্যেই

স্ট্যালিন রাশিয়ায় ও বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। শত অপপ্রচার সত্ত্বেও মহান স্ট্যালিন ইতিহাসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

কেন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটতে পারল

সোভিয়েট সভ্যতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার ভিত্তিতে মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন গতিধারা সৃষ্টি করেছিল। আবার এটাও ঠিক, প্রতিবিপ্লবের ফলে সোভিয়েট সমাজের অস্তিত্ব আজ আর নেই। আমরা দুঃখিত, ব্যথিত কিন্তু আমরা হতাশ নই। আমি ইতিহাসের শিক্ষা থেকে একটা কথা বলতে চাই, কোনও নতুন আদর্শ, আন্দোলনকে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে হলে, দীর্ঘদিন তার জয়-পরাজয়, সফলতা-বিফলতা থাকে। ধর্মীয় আন্দোলন দাবি করত তারা ঈশ্বরের শক্তিতে বলীয়ান। কোনও ধর্মীয় আন্দোলনই হঠাৎ করে জয়লাভ করেনি। খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বুদ্ধদেব অবশ্য ঈশ্বর মানতেন না, তিনি একটা আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সেই বুদ্ধের আদর্শের প্রচার, হিন্দুধর্মের বেদান্তের প্রচার— এ সবের প্রতিষ্ঠা করতে বহু বছর ধরে জয়-পরাজয়, বহু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এটাই হচ্ছে ইতিহাস। আজ যেটাকে আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলি, তার ইতিহাস কী? পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে নবজাগরণের সূচনা, আর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সফল হয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে। চূড়ান্ত জয়ের জন্য প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো বছর লেগেছে। নবজাগরণের পর্যায় অতিক্রম করার পর কখনও পার্লামেন্ট আসছে, কখনও রাজতন্ত্র আসছে, আবার পার্লামেন্ট আসছে আবার রাজতন্ত্র আসছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ুন, ফ্রান্সের ইতিহাস পড়ুন, তা হলে এ সব দেখবেন। তারপর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি স্থায়ী হল।

ধর্মীয় আন্দোলন শোষণ উচ্ছেদের আন্দোলন ছিল না। একটা শোষণের পরিবর্তে আর একটা শোষণ এনেছে। দাসব্যবস্থার পরিবর্তে রাজতন্ত্র এনেছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ এনেছে। আর, সমাজতন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য শোষণ উচ্ছেদ করা। তার মানে কয়েক হাজার বছরের যে শোষণ ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছে, তাতে কয়েক হাজার বছরের বিরুদ্ধে সত্তর বছর কতটুকু! এ কথা আপনাদের বুঝতে হবে।

মহান পথপ্রদর্শকদের অমূল্য শিক্ষা

এই বিষয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শকদের কিছু অমূল্য শিক্ষা আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে চাই। সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের প্রথম

স্তর হিসাবে অভিহিত করে মার্কস বলেছেন, "এই স্তরে আমরা যে কমিউনিস্ট সমাজ পাব, তা নিজস্ব গড়া ভিত্তির উপর দাঁড়ানো নয়, বরং বিপরীতে যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভ থেকেই এই নতুন সমাজ উদ্ভুত হয়, তাই আর্থিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত প্রতিটি দিক থেকে এই নতুন সমাজ পুঁজিবাদী সমাজের জন্মচিহ্ন বহন করবে।" (ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম)। মার্কসের এই শিক্ষার অর্থ হচ্ছে, পুঁজিবাদের আর্থিক, নৈতিক ও বোধবুদ্ধিগত প্রভাব সমাজতন্ত্রে বহাল থাকে।

মার্কস বলেছেন, "কমিউনিস্ট সমাজের উন্নততর পর্যায়ে যখন শ্রমবিভাগের সাথে ব্যক্তির দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন হবে এবং তার সাথে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অবসান হবে; যখন শ্রম শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপায় নয়, জীবনের প্রধান চাহিদা হিসাবে দেখা দেবে;যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমষ্টির সম্পদের ঝর্ণা আরও বিপুল ভাবে বইবে— একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ সীমানা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হবে এবং সমাজ ঘোষণা করতে পারবে— প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দেবে, পাবে প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে।" (ঐ) এর অর্থ হচ্ছে, উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি যতক্ষণ সমাজতন্ত্রে না ঘটছে ততক্ষণ সমাজে বুর্জোয়া রাইটসের বা অধিকারের ধারণা থাকছে। এই ছিল মার্কসের সতর্কবাণী।

মার্কস আরও বলেছেন, "পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে একটা পর্যায় থাকছে, যেখানে একটা আরেকটায় বৈপ্লবিক রূপান্তরিত হতে পারে।" (ঐ) এই পর্যায়কে মার্কস সর্বহারার বৈপ্লবিক একনায়কত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মার্কসের এই ঐতিহাসিক বক্তব্য অনুযায়ী এই পর্যায়ে সমাজতন্ত্র সঠিক বৈপ্লবিক পথে চললে সাম্যবাদে পৌঁছাবে, আর যদি বৈপ্লবিক লাইন থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে পুঁজিবাদ ফিরে আসবে।

এই সম্পর্কে বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, "তত্ত্বগত দিক থেকে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝখানে যে অন্তর্বর্তী স্তর থাকে সেখানে দুই রূপের অর্থনীতিরই বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলি (প্রপার্টি) একসঙ্গে থাকবেই। এই অন্তর্বর্তী স্তর হচ্ছে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ ও সদ্যজাত সাম্যবাদ অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে পরাস্ত হয়েছে কিন্তু ধ্বংস হয়নি যে পুঁজিবাদ এবং জন্ম নিয়েছে কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল যে কমিউনিজম এই দুয়ের সংগ্রাম। ...সর্বহারা একনায়কত্বের পর্বে সকল শ্রেণিগুলি থাকে এবং থাকবে।" (ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিকস আন্ডার দি ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট) তিনি আরও বলেছেন, "শোষকরা পরাস্ত হয়েছে কিন্তু ধ্বংস হয়নি। এরা আন্তর্জাতিক পুঁজিরই অংশ এবং তাদের ভিত্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক

পুঁজি থাকছে। তারা এখনও অংশত কিছু উৎপাদন যন্ত্রের মালিক, তাদের হাতে অর্থ আছে, এখনও ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক তাদের বজায় আছে। যেহেতু তারা পরাস্ত হয়েছে, তাদের বাধা দেওয়ার উদ্যম শতগুণ-সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিচালনায় তাদের 'আর্ট' (দক্ষতা) তাদের শ্রেষ্ঠতর অবস্থান দেয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাট, যে জন্য তাদের গুরুত্ব তাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। বিজয়ী শোষিতশ্রেণির অর্থাৎ সর্বহারার বিরুদ্ধে পরাজিত শোষকশ্রেণির দ্বারা পরিচালিত শ্রেণি সংগ্রাম ভয়ানক তীব্র হয়েছে।" (ঐ) ১৯২০ সালে আরও বলেছেন, "ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাদের শক্তি শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি বা আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে স্থায়ী সম্পর্কের শক্তিই নয়, ফোর্স অব হ্যাবিট (অভ্যাসের শক্তি), ট্রাডিশন এবং ক্ষুদ্র পুঁজির শক্তিও তাদের শক্তির উৎস। ...সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে পুরনো সমাজের শক্তিগুলি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এমন এক একটানা সংগ্রাম— যা কখনও রক্তাক্ত কখনও রক্তপাতহীন, হিংস্র আবার শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক রূপে চলতে থাকবে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের শক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি।" (লেফ্‌ট উইং কমিউনিজম, অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজঅর্ডার)

এখানে উল্লেখ করা দরকার, পরাজিত পুঁজিপতি ছাড়াও কোটি কোটি জনগণের মধ্যে পুরাতন সমাজের অভ্যাসের শক্তি ও ঐতিহ্য বলতে লেনিন জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা, সংস্কৃতি ও আচরণের শক্তিই বুঝিয়েছেন এবং একে ভয়ঙ্কর শক্তি হিসাবে পুঁজিবাদের সহায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন। একথা বুঝতে হবে যে, শোষিত জনগণ যতক্ষণ মার্কসবাদ ও কমিউনজমের চিন্তায় সুশিক্ষিত না হচ্ছে ততক্ষণ তারা শোষণমুক্তির আকাঙ্খায় বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকলেও তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মধ্যে এইসব বিষাক্ত প্রভাব অভ্যাসের শক্তি রূপে থাকে, নেতৃত্বকে সজাগ থেকে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালাতে হয়। কমিউনিস্ট দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও উন্নত-অনুন্নত মানের পার্থক্য থাকে, যারা পিছিয়ে থাকে তাদের মধ্যেও এইসব বুর্জোয়া অভ্যাসের শক্তি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। ফলে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ও সংস্কৃতির লক্ষণগুলি দূর করার জন্য অবশ্যই সচেতন সংগ্রাম চালাতে হয়।

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে মহান স্ট্যালিনের গভীর উদ্বেগ

মহান স্ট্যালিন সোভিয়েট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র যত এগোবে, শ্রেণি সংগ্রাম তত তীব্রতর হবে। তিনি বার বার উদ্বিগ্ন

হয়ে বলেছিলেন, নেতা-কর্মীদের আদর্শগত মান উন্নয়ন করার সংগ্রাম অবহেলা করা হচ্ছে। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পর সমগ্র বিশ্বে স্ট্যালিন বন্দিত, সর্বত্র সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে, যুদ্ধে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত যে রাশিয়ার অর্থনীতি পুনরায় শক্তিশালী হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুর আগে শেষ পার্টি কংগ্রেস ১৯তম কংগ্রেসে তিনি পার্টি ও সমাজতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে যত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ততটা ইতিপূর্বে অনেক গুরুতর সংকটের সময়ও শোনা যায়নি। তিনি বলেছেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বড় সাফল্য আমাদের দলের কর্মীদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি, হামবড়া ভাব সৃষ্টি করেছে। ...অনেক দায়িত্বশীল কর্মীও ভাবছে আমরা সবকিছুই করতে পারি। আমাদের অসাধ্য কিছু নেই... সব ঠিকঠাক চলছে, নিজেদের নিয়ে তাদের আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ...তারা সভা-সমাবেশ, প্লেনারি সভা ও সম্মেলনগুলিকে ফাঁপা গৌরব প্রকাশের, আত্মপ্রশংসার স্থলে পরিণত করছে, ব্যুরোক্র্যাসি ও অধঃপতন নোংরা রূপে দেখা যাচ্ছে, ...কর্মী নির্বাচনে ও দায়িত্ব বহনে স্বজন পোষণ ও তোষামোদকারীদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে; ...কিছু কিছু মিটিং আত্মগরিমা প্রচারে পর্যবসিত হচ্ছে; কোন কোন ক্ষেত্র থেকে সাফল্যের অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, শৃঙ্খলা অমান্য করার ঝোঁকও দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও গভীর উদ্বেগের সাথে বলেছেন, "আমাদের সমাজে বুর্জোয়া আদর্শের ধ্বংসাবশেষ (vestige) রয়ে গেছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা ও নৈতিকতার অবশিষ্টাংশ (relics) রয়ে গেছে। এইগুলি নিজের থেকে ধ্বংস হয় না, দীর্ঘ দিন টিঁকে থাকে এবং শক্তি বাড়াতে পারে, ...জনগণের মনে পুঁজিবাদী মানসিকতা আজও টিকে আছে, পূর্বতন সমাজ থেকে যেসব সংস্কার ও অত্যন্ত ক্ষতিকারক আচার-আচরণ রয়ে গেছে, এসব থেকে মুক্ত করার জন্য পার্টিকে গুরুত্ব দিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে।"

আমাদের বুঝতে হবে, ১৯১৯-২০ সালে লেনিন জনগণের মধ্যে যে বুর্জোয়া অভ্যাসের শক্তি, আচরণ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ অগ্রগতির পর ১৯৫২ সালেও সেগুলির বিপজ্জনক উপস্থিতি লক্ষ্য করে মহান স্ট্যালিন আদর্শগত সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানে আর একটা কথাও আমাদের বুঝতে হবে, পুরনো সমাজের অভ্যাসের শক্তি, আচরণ, সম্পত্তির মালিকানার মানসিকতা যাই যাই করেও সহজে যায় না। কয়েক হাজার বছর আগে জাত-পাতের জন্ম হয়েছে, দাসপ্রথা যুগে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আজও তার জের চলছে। তেমনি দাসপ্রথা যুগ থেকেই সম্পত্তির মালিকানা বোধ গড়ে উঠেছে, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ তাকে আরও শক্তিশালী

করেছে। ফলে কয়েক হাজার বছরের এই সম্পত্তির মানসিকতা ও সংস্কৃতি নির্মূল করা সহজ নয়। আবার এই কঠিন কাজটাই সফল হতে পারে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তীব্র আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক শ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা। তিনি আরও বলেছেন, "বিজ্ঞান ও অন্যান্য আদর্শগত চর্চার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো তত্ত্বগত পথনির্দেশ না দেওয়ায় এবং দেখভাল করার অভাবে প্রায়ই প্রকাশিত পুস্তকে, ম্যাগাজিনে, সংবাদপত্রে গুরুতর ত্রুটি ও বিকৃতি দেখা যাচ্ছে, ...যে সব বিভাগে পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাব শিথিল হয়েছে সেইখানেই পার্টি কর্তৃক পরাস্ত লেনিনবাদ-বিরোধী যে সব গ্রুপের অবশিষ্ট এখনও রয়েছে, তারা এই বিভাগগুলির দখল নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেগুলি ব্যবহার করে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী পরিচালনা করবে, যাবতীয় অমার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটাবে, ...কিছু পার্টি সংগঠন আদর্শগত বিষয় ভুলে গিয়ে সকল দৃষ্টি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ করছে"। এরপরই তিনি ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছেন, "বাইরের পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে এবং ভেতরের সোভিয়েট রাষ্ট্র বিরোধী যে সব গ্রুপগুলির অবশিষ্টাংশকে আমরা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারিনি, এই উভয়ের থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রবিরোধী মতামত, ভাবনা এবং সেন্টিমেন্টের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আমাদের গ্যারান্টি নেই।"

আরও গুরুতর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "...আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব দুর্বল হলে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব শক্তিশালী হবে। আদর্শগত চর্চা পার্টির প্রধান কর্তব্য, এর গুরুত্ব কমালে পার্টি ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।" এইভাবে স্ট্যালিন যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সেটাই ঘটল, সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতিই হলো। স্ট্যালিনের যে বক্তব্যগুলি উল্লেখ করলাম, তাতে একথা বোঝা যাচ্ছিল ভেতর ও বাইরের সোভিয়েট রাষ্ট্র বিরোধী আক্রমণ সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। ভেতরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা ও নৈতিকতার অবশিষ্টাংশের শক্তিবৃদ্ধি, পুরনো বুর্জোয়া সমাজের সংস্কার ও ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের প্রভাব, লেনিনবাদ-বিরোধী গ্রুপের ষড়যন্ত্র এবং সর্বোপরি বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই সময়ে বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব কতটা থাকলে তিনি বলতে পারলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা লঘু করে দেখলে বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব বাড়বে এবং রাষ্ট্র ও পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। সমাজতন্ত্র বিরোধী এইসব শক্তিগুলি যে বিপদ ঘটাতে পারে তিনি বুঝেছিলেন এবং শেষ জীবনে আর একটা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে পার্টিকে প্রস্তুত করার জন্যই তিনি এইসব সংকটের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং এই সংগ্রাম অপূরিত থেকে যায়।

ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা রটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দলের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী চিন্তা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া

এটা পরিষ্কার সমাজতন্ত্র-বিরোধী যে সব শক্তি ও চিন্তাধারা সোভিয়েট ইউনিয়নে মাথা তুলেছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে স্ট্যালিন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, সেইসব শক্তি ও চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসাবেই ক্রুশ্চেভ পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল করে এবং স্ট্যালিন বিরোধী কুৎসা রটিয়ে লেনিন-স্ট্যালিন অনুসৃত বিপ্লবী লাইন পরিত্যাগ করে এবং এইভাবে কমরেড শিবাদাস ঘোষের ভাষায় "সংশোধনবাদের ফ্লাড গেট খুলে দেয়", যার দ্বারা ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটিয়ে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন, "উদারনৈতিকতাবাদের রাস্তা এবং পার্টির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের সমস্ত বিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলির অনুপ্রবেশের রাস্তা খুলে দেওয়া— সোভিয়েট ইউনিয়নের শোধনবাদী নেতৃত্ব সেইটাই করেছেন" (চেকোস্লোভাকিয়ায় মিলিটারি হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে)। ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিন-বিরোধী কুৎসা রটনার পিছনে মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "তাঁর পূর্বসূরী মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো স্ট্যালিনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একজন অথরিটি। তাই, স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা। ...এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যায় আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি — তাকেই অস্বীকার করা। ফলস্বরূপ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তা-ভাবনার আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে)। ধুরন্ধর ক্রুশ্চেভ ও তার সমর্থক শক্তি বুঝেছিল যে স্ট্যালিনের অথরিটিকে অস্বীকার না করতে পারলে তাদের দুরভিসন্ধি সফল হবে না। কারণ, স্ট্যালিন আর সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমার্থক হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত জনগণের কাছে। তাঁর প্রতি জনগণের প্রবল আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। যদিও এটা উন্নত আদর্শগত মান প্রসূত ছিল না। তাই ক্রুশ্চেভচক্র 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ', 'সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ' করতে করতে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে করতে এবং স্ট্যালিনের এক তরফা মিথ্যা কুৎসা রটনা করে তাদের ষড়যন্ত্র হাসিল করল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, সদস্য ও জনগণের চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুন্নত মান থাকলে কী সর্বনাশ হতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে, তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা,

সমস্ত শ্রমিকশ্রেণি বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে পারে" (চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব)। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের জোয়ার চলছে তখন ১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "এতকাল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা সংগঠনের একপেশে রুটিন কাজের উপরেই প্রধানত জোর দিয়ে এসেছেন, আদর্শগত চর্চার সাথে যুক্ত করে সংগঠন করার কাজকে একদম গুরুত্ব দেননি। ...যার ফলে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসীয় বিজ্ঞানে ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়েছে তা কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। ...বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তা পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত।" (সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা)। কিছুদিন পর আর একটি ত্রুটিও কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে বলেছিলেন, "লেনিন পরবর্তীকালে মানবজীবনে এবং শ্রেণিসংগ্রামের সামনে যে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনগত উপলব্ধির যে বিকাশ ঘটানো উচিত ছিল, লেনিনের পর তা আর করা হয়নি।" (স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে)। এই না হওয়ার স্বীকৃতি স্ট্যালিনও ১৯তম কংগ্রেসের রিপোর্টে দিয়েছেন। লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির আভ্যন্তরীণ গুরুতর সংকট, অতিদ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরণ পণ লড়াইয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি কারণে হয়ত স্ট্যালিন এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারেননি। অবশ্য মৃত্যুর আগে তিনি শুরু করেছিলেন এবং তিনি নিজে অর্থনীতি ও ভাষাতত্ত্ব প্রশ্নে দুইটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুজনিত কারণে অন্যান্য বিষয়ে আর হাত দিতে পারেননি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন। প্রথমত তিনি বলেছিলেন, "রাশিয়ার সমাজে এবং বিপ্লবের এত বছর পরেও চীনের সমাজে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পদ্ধতিতে চিন্তায় অভ্যস্ত এমন লোকের সংখ্যা আজও অত্যন্ত নগণ্য। যারা সাধারণভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদ কিছু বোঝেও, এরূপ অন্যান্যদের মধ্যেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা ভাসাভাসা প্রভাব রয়েছে মাত্র। আবার সেই সমস্ত লোক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিতে যারা চিন্তাভাবনা করে এবং কাজ করে, অর্থাৎ পার্টিটাকে ধরা হচ্ছে— তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া মতাদর্শের 'কনফিউশনস', আধুনিক সংশোধনবাদের প্রভাব" (চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব)।

আর দ্বিতীয়ত তিনি বলেছিলেন, "চীনের বিপ্লবটাই ছিল শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সেখানে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সঙ্গে ছিল। রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা স্তর পর্যন্ত বুর্জোয়ারা এগিয়েছে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে থেকেছে। তারপর বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় বসে বুর্জোয়া শ্রেণিশাসনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার আগেই সর্বহারা শ্রেণি দ্রুত বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছে। এরপর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই কারণে সেখানে তখন ব্যক্তিবাদের একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল" (দ্বন্দ্বমূলক বিচার পদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান)। তিনি দেখিয়েছেন, বিপ্লবের সময় ও তারপর কিছুদিন এই ব্যক্তিবাদের একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারপরও এই ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে যাওয়ায় তিনি বলছেন, "সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব অর্জন করার সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ সুবিধায় পর্যবসিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে যাকেই আমি 'সোস্যালিস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিজম' বা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নতুন ধরনের ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ বলে উল্লেখ করেছি" (চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব)। তারপর তিনি বললেন, "যাঁরা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সব সময় পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থকে বড় মনে করে এবং তার কাছে ব্যক্তি স্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সেই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিস্ট— এইটাই ছিল এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান। কালিনিনের 'কমিউনিস্ট এডুকেশন' বইয়ে এটাকেই সত্যিকারের কমিউনিস্টের চেতনার উচ্চতর মান বলা হয়েছে। ...কিন্তু আজকের এই নতুন পরিস্থিতিতে এটা আর সত্যিকারের উঁচুদরের কমিউনিস্টের মান হতে পারে না। ...ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে— যেখানে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেবার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের এ এক নতুন মান, সেটা পুরনো বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ, যা এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক" (ঐ) কমরেড শিবদাস ঘোষের এই প্রসঙ্গে আরেকটা ওয়ার্নিংও আপনাদের কাছে রাখতে চাই, তিনি বলেছেন, "ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব, তার রূপ বিরোধাত্মক। ...কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ ও

সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও ব্যক্তিকে সামাজিক স্বার্থের কাছে 'সাবমিট' করতেই হবে এবং ততদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রিপ্রেসিভ ক্যারেক্টারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানসের বিদ্রোহ করার ঝোঁক বারবার দেখা দিতে থাকবে এবং এর ফলে সামাজিক লক্ষ্যটা বারবার মার খেতে থাকবে, ...সামাজিক অনীহার মনোভাব বাড়তে থাকবে। ফলে, কমিউনিস্ট আদর্শের যে জোর, 'ডেডিকেশনের' যে জোর তা কমে যাবে। আর নয় আরেকটা হবে— 'লিবারালাইজেশান'। অর্থাৎ, ক্রমাগত দাবি উঠবে যে, ব্যক্তির অধিকার আরও বাড়াতে হবে। আর, এইভাবে চলতে থাকলে তা পুনরায় সংশোধনবাদের জন্ম দেবে এবং পুঁজিবাদকেই ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।" (ঐ)

কী কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে সংশোধনবাদ মাথা তুলতে পারল সেই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "...সেখানে যৌথ খামার প্রথা রয়েছে, যেমন পণ্য উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা (commodity circulation) রয়েছে, যেমন ব্যক্তিসম্পত্তির অস্তিত্ব— বাড়ি ঘর, টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্কে টাকা জমানো এগুলি রয়েছে, মূল্যের নিয়ম (law of value) চালু আছে। এইসব জিনিসগুলির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বীজ সেখানে নষ্ট হয়ে যায়নি। এটা যতদিন থাকে, অর্থনীতিতে সমাজ অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের ঝোঁক ততদিন থাকে। ...তবে গোড়ার দিকে তার শক্তি যতটা থাকে, সমাজতন্ত্রের বিজয় যত এগুতে থাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে তত কোনঠাসা হয়ে তার আক্রমণ করবার, প্রতিরোধ করবার, প্রতিবিপ্লব ঘটাবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, যদিও উপর কাঠামোতে (superstructure) অর্থাৎ আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রাম আরও তীব্র ও সুক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। ...আবার এটাও মনে রাখা দরকার যে, এই সংশোধনবাদ আসার পরিপূরক অর্থনৈতিক উপাদানগুলি সেখানে ছিল বলেই তা আসতে পেরেছে। আসার মতো অর্থনৈতিক উপাদান সমাজে না থাকলে তা আসতে পারত না। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই আপনাআপনি সংশোধনবাদ এনে দেয়নি। এটা আনবার মত শক্তিই তার সেখানে ছিল না। রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান এই প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিল। ...একে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চেতনার উন্নত মান বজায় রাখা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন পরিবেশে নতুন করে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ঘটানো" (চেকোস্লোভাকিয়ায় মিলিটারী হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে)।

আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই, ইতিপূর্বে দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ তিনটি সমাজেই শোষকশ্রেণি যেমন এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে সৃষ্টি করেছে যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক ধনসম্পত্তির মালিক হবে, অধিকাংশ মানুষ শোষিত-বঞ্চিত থাকবে তেমনি আরেকটি ধারণাও শোষিত জনগণের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়ে দিয়েছে যে, কিছু প্রতিভাবান-বুদ্ধিমান মানুষই জ্ঞানের অধিকারী হবে, অধিকাংশ মানুষ কায়িক শ্রম দেবে, গায়ে গতরে খাটবে, অত সব জ্ঞান চর্চার ক্ষমতা থাকবে না বা প্রতিভা সকলের থাকে না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং ও শিবদাস ঘোষ সকলেই অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির জন্য যেমন লড়েছেন, তেমনই সকল শোষিত জনগণের অবাধ জ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্যও লড়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা, সর্বহারা জনগণ বিপ্লবের জন্য যেকোন কষ্ট স্বীকার করতে, যেকোন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে, এমন কী মৃত্যু বরণ করতে যতটা আগ্রহী, কিন্তু যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সংস্কার থেকে মুক্ত না হওয়ায় তত্ত্ব চর্চা করতে, জ্ঞান চর্চায় ততটা আগ্রহী থাকে না, একটা অনীহা কাজ করে। তাই স্ট্যালিন এমন পর্যন্ত বলেছেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা না হলে বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব বাড়বে, রাষ্ট্র ও পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হবে।" তাঁর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও দলের কর্মী ও জনগণ এই আবেদনের মূল্য না দেওয়ায় কী ক্ষতি হয়ে গেল! এর থেকেও আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

মহান মাও সে তুং-ও চীনে প্রতিবিপ্লব প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আহ্বানের সময় বলেছিলেন, "যদিও বুর্জোয়ারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তবুও এরা শোষকশ্রেণিদের পুরাতন ধারণা, সংস্কৃতি, আচরণ ও অভ্যাসকে ব্যবহার করছে জনগণকে দূষিত (corrupt) করে তাদের মন জয় করে ক্ষমতা পুনর্দখল করতে। সর্বহারা শ্রেণিকে এর বিপরীতে কাজ করতে হবে; আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের প্রত্যেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং সর্বহারাশ্রেণির নূতন ধারণা, সংস্কৃতি, আচরণ ও অভ্যাসকে সমগ্র সমাজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হবে, যে সব ব্যক্তিরা অথরিটিতে থেকে পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা।" (চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে ১৬ পয়েন্ট ঘোষণাপত্র)।

এতক্ষণ আমি মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করলাম এঁরা সকলেই বলেছেন, বিপ্লবী আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও, এমনকী তার অগ্রগতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের উপাদান থাকে, আবার তার মানে

এই নয় যে উপাদানগুলি থাকছে বলেই প্রতিবিপ্লব সফল হবে। এটা নির্ভর করছে পার্টি ও জনগণ ক্রমাগত আদর্শ ও সংস্কৃতিগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে নির্মূল করার জন্য সঠিক পথে সংগ্রাম করছে কিনা, অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজিবাদের উপাদানগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক গঠনের সাথে সাথে সুপারস্ট্রাকচারে বা উপর কাঠামোতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, ব্যক্তিগত মালিকানার মানসিকতা ও সংস্কৃতি, পুরনো সমাজের অভ্যাস-আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে এগুলি নিশ্চিহ্ন সঠিকভাবে করা হচ্ছে কি না, না হলে সুপারস্ট্রাকচার থেকে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ কাঠামোকেও ধ্বংস করে। মার্কসবাদী নেতাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এই শিক্ষাই আমাদের নিতে হবে।

সমাজতন্ত্র ধ্বংসের ফলে সমগ্র বিশ্বের কী চরম ক্ষতি হয়েছে

রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হলে শুধু রাশিয়ার শ্রমিকরাই ক্রীতদাস হবে না, বিশ্বে কয়েক যুগ অন্ধকার নেমে আসবে। ঘটলও তাই। যতদিন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ছিল, ততদিন দেশে দেশে শুধু বিপ্লবী আন্দোলনই নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন সহ নানা প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল, মূল্যবোধের চর্চা ছিল। আজ সবই বিনষ্ট হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সৃষ্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের আগুন, ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, নৃশংস গণহত্যা, গণতান্ত্রিক চেতনার অবলুপ্তি, মূল্যবোধের অবলুপ্তি সব দেশেই ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে পারত না। সিরিয়ার উপর হামলা চালাতে পারত না। যেমন বিগত শতাব্দীতে পাঁচের দশকে মিশরের উপর আক্রমণ শুরু করেও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট বৃটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের হুঁশিয়ারিতে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় থেকে কমিউনিস্টদের শিক্ষা নিতে হবে

এই অবস্থায় এটা মর্মান্তিক বেদনার যে, সেই সমাজতন্ত্র প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এতে হতাশার কোনও স্থান নেই। আমি আগেই বলেছি, ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয়ের জন্য কয়েক শত বছর লেগেছে, সেখানে হাজার হাজার বছরের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সত্তর বছর কতটুকু সময়! ফলে কী কী কারণে

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হল এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে আমাদের বিপ্লব করতে হবে। যেমন ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে শ্রমিক অভ্যুত্থানে প্যারি কমিউন তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। তারপর তাকে বুর্জোয়ারা ধ্বংস করেছিল। এর থেকে মার্কস শিক্ষা নিয়ে বলেছিলেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করলে শ্রমিক বিপ্লব জয়যুক্ত হবে না। লেনিন তাই কার্যকর করেছিলেন। আগামী দিনে কমিউনিস্টদেরও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিবিপ্লব থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোতেই নয় সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোতেও তীব্র আদর্শগত-সংস্কৃতিগত শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে পুঁজিবাদকে নির্মূল করতে হবে। এভাবে আর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হতে দেবে না।

শোষিত জনগণের বর্তমান কর্তব্য

ফলে আজ আমরা কী করব? আমাদের সামনে দু'টি পথ আছে। হয় বিশ্বে ও আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকুক, শোষণ অত্যাচার চলুক, বেকারত্ব বাড়ুক, ছাঁটাই বাড়ুক, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়ুক, আত্মহত্যা বাড়ুক, নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা বাড়ুক, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হোক, মূল্যবোধ ধ্বংস হোক, বিবেক ধ্বংস হোক, গণধর্ষণ ও হত্যা বাড়ুক, শিশুকন্যা ধর্ষণ বাড়ুক, বৃদ্ধা নারী ধর্ষণ বাড়ুক— এটাই চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে। না হয়, এর হাত থেকে আমরা মুক্তি চাইব। সেই মুক্তির পথ কী? সোভিয়েত বিপ্লব দেখিয়ে গেছে মহান নভেম্বর বিপ্লবই সেই মুক্তির পথ।

আজ মানবসভ্যতা চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ পচা গলা মৃতদেহ, দুর্গন্ধময়। বৃদ্ধ বাবা-মাকে গলা টিপে হত্যা করছে সন্তান সম্পত্তির লোভে। স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে, স্ত্রীকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই তো পুঁজিবাদ! কোথায় মানবিকতা, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় রুচি-সংস্কৃতি! বুর্জোয়া দলগুলো ক্ষমতালিপ্সু। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মাল্টিন্যাশনাল, কর্পোরেট সেক্টর, মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের সেবা, তাদের গোলামি করা। আর গদিতে বসে তারাও কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, কালো টাকার কারবার করছে। এই কিছুদিন আগে পানামা পেপার্স বেরিয়েছে। সদ্য প্যারাডাইস পেপার্স বেরিয়েছে। বিশাল কালো টাকার কেলেঙ্কারি। ভারতবর্ষের ৪১৭ জন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, শিল্পপতির নাম আছে। বিশ্বেরও বহু শিল্পপতি, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীর নাম আছে। সুইস ব্যাঙ্ক এক হাজারের বেশি ভারতীয় কালো টাকার কারবারিদের নাম দিয়েছে। সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? সবাই শুধু বক্তৃতায় ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে। যত দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছে ততই দুর্নীতি বাড়ছে, এরা নিজেরাই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমরা কি এটা চলতে দেব? তা হলে ভবিষ্যৎ কী?

নভেম্বর বিপ্লব ইতিহাসে প্রমাণ করেছে, সমাজতন্ত্র কী মহান সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে

একমাত্র মুক্তির পথ নভেম্বর বিপ্লব— সমাজতন্ত্র। এটা আশার কথা, অত্যাচারিত মানুষ মাঝে মাঝে মাথা তুলছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। আমেরিকায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট শুধু একবার নয়, বার বার মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই আন্দোলন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে, ইটালিতে, গ্রিসে, ফ্রান্সে বার বার শ্রমিক ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে কৃষকরা বিদ্রোহ করছে, গুলির মুখে দাঁড়িয়ে লড়ছে। শ্রমিকরা লড়ছে। ছাত্ররা লড়ছে। বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র। তারা পরিবর্তন চায়। প্রতিকার চায়। মুক্তি চায়। কিন্তু কোথায় পরিবর্তন, কোথায় মুক্তি! এই পথ তাদের জানা নেই। এই পথ দেখাতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা। এই পথ দেখাতে পারে মহান নভেম্বর বিপ্লব। এ দেশে এই বিপ্লব সংগঠিত করা আমাদের দলের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। যার জন্য আমরা শতবর্ষ উদযাপনে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা দায়সারা গোছের একটা হল মিটিং করে নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন করিনি। একটা বছর ধরে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী আমরা প্রচার করেছি। এটা খুব আনন্দের কথা, আশার কথা, নভেম্বর বিপ্লবের প্রচার দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমাদের সমর্থন করেছেন, চাঁদা দিয়েছেন। এ সব দেখে আমরাও অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ফলে আজ পুনরায় এ কথা বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ অন্তিম লগ্নে উপনীত। এই শব দাহ করতে পারে একমাত্র সচেতন শ্রমিক শ্রেণি, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়, উন্নত নৈতিকতার আধারে প্রথমে গণকমিটি, পরে বিপ্লবী কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে পারে। অবশ্য প্রথমে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে অন্যান্য সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর সাথে যুক্ত আন্দোলন করে তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমগ্র জনগণের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এই পথে অগ্রসর হতে হবে। ভারতবর্ষের বুকে এই কাজটি আমাদের করতে হবে। শ্রেণি সংগঠন, গণআন্দোলন গড়ে তোলা, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। মহান লেনিন বলেছেন, নির্বাচনে লড়বে, এমএলএ-এমপি হবে কিন্তু বাইরে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনের পথে বিপ্লব হয় না— এটা তাঁর শিক্ষা। যে পথ সিপিএম-সিপিআই গ্রহণ করেনি। যার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ যুক্তফ্রন্টের সময়ে বলেছিলেন, আমরা যারা বামপন্থী, তারা সরকার চালাব— বুর্জোয়া সরকারের পথে নয়। আমরা সরকার চালাব শ্রেণিসংগ্রামকে,

গণআন্দোলনকে জোরদার করার জন্য। লেনিনের সময় সরকার গঠনের প্রশ্ন ছিল না, তাই তিনি এ কথা বলেননি। পরবর্তী সময়ে নতুন অবস্থায় লেনিনের শিক্ষাকে আরও ডেভেলপ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ এ কথা বলেছিলেন, সরকার গড়লেও একই উদ্দেশ্যে এই সরকার শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্যই কাজ করে যাবে। এই প্রশ্নেও সিপিএমের সাথে আমাদের তীব্র মতভেদ হয়েছিল। ৩৪ বছর ধরে তারা পশ্চিমবঙ্গে বুর্জোয়া সরকারের মতোই শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন বিরোধী ভূমিকা নেওয়ায় একদা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র বলে পরিচিত এই রাজ্যের হাল কী হয়েছে, সকলেই দেখছেন। সিপিএমের কর্মী-সমর্থক যাঁরা এই মিটিংয়ে উপস্থিত, তাঁরাও নিশ্চয়ই বুঝছেন।

তা হলে আমরা গণআন্দোলন করব নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে। শ্রমিকের শ্রেণিসংগ্রাম, গরিব কৃষকের শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলব, নির্বাচনেও লড়ব বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে। এই আন্দোলনে অন্য দল সাথী হলে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলব। আবার একই সাথে যেমন প্রতিবেশী বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি তে, সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সাহায্য করে যাব, সমর্থন করে যাব, আবার আরও নানা দেশে যারা কমিউনিস্ট মুভমেন্টের উদ্যোগ নিচ্ছে তাদেরও সাহায্য করে যাব আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে। আমি যে কথা বলতে চাই এবং যেটা দিয়ে বক্তব্য শেষ করতে চাইছি— অল রোডস লিড টু নভেম্বর রেভলিউশন। ক্যারি ফরোয়ার্ড দি মেসেজ অফ নভেম্বর রেভলিউশন।

লং লিভ মার্কসইজম-লেনিনইজম-শিবদাস ঘোষ থট।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

লং লিভ প্রোলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম।

লং লিভ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি।

রেড স্যালুট টু বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)।

রেড স্যালুট টু গ্রেট মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ-শিবদাস ঘোষ।